নব্বইয়ের এপার বাংলা, ওপার বাংলা :
'আমাদের মতো করে কথা বলো উনিশশ নব্বই'

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

১.

আজ থেকে ঠিক ৬ বছর আগে সামসুল আলম সম্পাদিত 'অভিভব' পত্রিকার তরফ থেকে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম নব্বই দশকের কবিতা নিয়ে একটি আমন্ত্রিত গদ্যের জন্য। প্রথমে আমি সম্মত হতে পারিনি এইজন্যে যে দশকটা তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে, বড্ড কাছ থেকে দেখতে গেলে যে-কোনো দৃশ্যই বরং অস্পষ্ট হয়ে যায়, এমন কি তখনও আমাদের স্থির বিশ্বাস আমরা তৈরি করতে পারিনি একেকজনের স্থায়িত্ব বিষয়ে, জানতাম না কে লিখতে এসেছেন নিছক কবিতাপ্রবণ একটা বয়েসের ঝোঁকে, শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক তাড়নায়, আর কবিতার প্রতি কার দায়বদ্ধতাটা খাঁটি, দীর্ঘমেয়াদী। সে সংখ্যায় যে লিখিনি তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণত কোনো মূল্যায়ন সেই সময় যে আমার দ্বারা তেমনভাবে সম্ভব হবে না, এমন নিঃসংকোচ স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেই লিখেছিলাম কিছু। ওপরের ওই কারণগুলোকে প্রেক্ষিতপটে রেখেই সঙ্গতভাবে রচনাটির নামকরণ করেছিলাম 'লেখা লিখতে না পারার লেখা'। এ লেখার প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা হিসেবে আমার সেদিনের কথাগুলোকেই আরেকবার ফিরিয়ে আনি–

> 'আমি আর পাঁচ/দশ বছর অপেক্ষার পর জেনে নিতে চাই কে কে কবিতার কাছে নতজানু হয়ে একটা সত্যিকারের দায়বদ্ধতা নিয়ে এসেছিলেন এই সংসারে; আর কারা সময় ফুরোবার আগে নিজেদেরই ফুরিয়ে ফেলে কী অবলীলায় রুমাল নাড়িয়ে চলে গেলেন এখান থেকে। কেউ কেউ কবি হতেই আসেন, আর কারুকে কারুকে বানিয়ে তোলা হয় কবি হিসেবে,– এই তফাৎটুকু বুঝে নেওয়ার জন্যও, আগে যা বলেছি, আবারও বলি, জরুরি ওই সময় দূরত্বটাই। আর কিছু নয়।'

পাঠকের কাছে, বিশেষ করে নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখি : খুব কি ভুল বলেছিলাম সেদিন? এড়িয়ে যাওয়ার মতো কোনো কিছু ছিল কি আমার ওই বিবৃতির একটি বাক্যের মধ্যেও? যদি কেউ তা আবিষ্কার করেন, আমাকে তিনি ভুল বুঝবেন। অক্ষমতার সমার্থক শব্দ নয় নির্লিপ্ত, হতে পারেও না। প্রত্যেক দশকেই দেখেছি কেউ কেউ অতিরিক্ত লিখে এবং নিরন্তর পাঠকের চোখে চোখে থেকেও শেষমেষ আমাদের ন্যূনতম বিবেচনার যোগ্যই হয়ে উঠতে পারলেন না, আবার দারুণ শুরু করেও একেকজন ভ্রষ্ট হয়ে গেলেন অল্প সময়ের মধ্যে। নতুন কথা কিছু নয়। নব্বই দশক প্রাক্তন দশক থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী কোনো দৃষ্টান্তও নয়। 'এখানে উৎসব সারারাত হ্যাজাকের আলো ঘিরে–/ সকালবেলায় সৎকার সমিতির গাড়িতে আমরা তুলে দিতে এসেছি/মৃত পোকাদের/মর্গের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা পোকাদের আত্মীয়স্বজন'– এই পঙক্তিমালা যিনি লিখতে পারেন, সেই বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কি আমাদের দৃষ্টির বাইরেই চলে গেলেন? কোথায় লেখেন ইদানীং সাম্যব্রত জোয়ারদার, শুরুতেই চমকে-দেওয়া মূলত গদ্যপ্রধান সেই কবি? কিংবা একেবারে হারিয়েই কি গেলেন আবর সিংহ? 'নিরক্ষর চাঁদের আলোয়', 'রাত্রি কুড়িয়ে কুড়িয়ে', 'মাঝি নয়, চাঁদ'– এসব তো তাঁরই লেখা, আর তা যদি হয়, কম লিখতে লিখতে একেবারে থেমে

যাওয়ার কি ব্যাখ্যা? সম্পন্নতায় টান পড়ল, ফুরিয়ে এল কথা? হীনমন্যতা? নাকি তত নিবেদিত দায়বদ্ধতা রাখতে পারলেন না এদের কেউই? অন্যজাতের পেশা কি শুষে নিল এদের কবিতারস? কিংবা আরো অন্যতর দুর্জয় কোনো কারণ, পরিস্থিতির চাপ, হতাশা কিছু?

আবার এসবের থেকে অন্যরকম কিছু শোনবার জন্যও উদগ্রীব থাকি, থাকতে হয়, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রজন্মের কবি রহমান হেনরী যেমন জ্ঞাপন করেন : 'কবিতা লিখি প্রথমত নিজের জন্য। দ্বিতীয় সেই সব মানুষের জন্য, পাঠকের জন্য, যাঁরা ছাই খেটেও অমূল্য রত্নের সন্ধান করতে জানেন। মিডিয়ার বামন সম্পাদক কিংবা আত্মম্ভরী বুদ্ধিজীবীর প্রশংসা, মূল্যায়ন ও কৃপাদৃষ্টির আশায় কখনই কবিতা লিখিনি; লিখবো না–। কবিতা চূড়ান্ত বিচারে লিখি বাংলা কবিতার জন্যই।' এর পাশেই রাখি আমাদের সাম্যব্রত-র দীর্ঘ বিবৃতি, যাঁর কথা এই কিছুক্ষণ আগেই তুলেছি আমার লেখায়। কী বলতে চাইছেন তিনি, শোনা যাক : "কোনো সময়ই প্রশংসা, শিরোপা কুড়ানোর জন্য আমি 'কবিতা' লিখি না। মৃত্যু পরবর্তী কবিখ্যাতিতে আমি বিশ্বাস করি না। জীবনানন্দ দাশ মহাশয় কেন যে ট্রাঙ্ক ভর্তি এতোসব লেখালেখি সুন্দর করে সাজিয়েগুছিয়ে রেখেছিলেন তার কোনও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। লেখালেখির প্রাথমিক পটে যখন আমার অল্পস্বল্প নামটাম হচ্ছে তখন নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হতো। মনে মনে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ে ফেলেছি হয়তোবা। পরে বুঝেছি এহেন ছোটখাটো সাফল্যের কোনও সামাজিক স্বীকৃতি নেই। একেতো কবিতাভাবনার উৎস সময় ও স্পেসের বাইরে, সঙ্গে কবি মাত্রই সমাজ বদলের একটা ন্যূনতম চেষ্টা আমার পাশে ছায়ার মতো আছে। এসব ভেবেই আজকাল, আমার পারিবারিক সদস্য, অর্থাৎ বাবা, মা, ভাই, বোন এবং কিছু বন্ধুবান্ধব ছাড়া কারুর সঙ্গে কমিউনিকেট করতে ইচ্ছে করে না। কবিতা লেখার প্রয়োজন ফুরোয়। দূরের পাঠক আশা করি ভুল বুঝবেন না।' বিবৃতির সমস্তটাই যে সাম্যব্রত-র নিজের কথা তা হয়তো নয়, আমার মনে হয় তাঁর জবানিতে আমরা খুঁজে নিতে পারি নব্বই দশকের সকলের না হলেও মুষ্টিমেয় কারুর কারুর ভাষ্য,– যাঁরা শুধু কবির তকমা পেতেই আকাঙ্ক্ষিত নন, লেখেন না কেবল প্রচারিত হওয়ার দুর্মর মোহ থেকে, এবং সমাজের প্রেক্ষিতে তাঁদেরও যে কিছু অংশগ্রহণের অঙ্গীকার আছে, ভুলে যান না সে ভূমিকাও।

২.

নব্বই দশক।

আলোচনার অবকাশে তার পাঠককে বারেবারে এবং বরাবরের মতো দাঁড় করিয়ে দিতে হয় 'দশক' এই বিভ্রান্তিকর ও অস্বচ্ছন্দ শব্দটির সামনে। কী ও কেন এই দশক? যাঁরা নব্বইয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁদের সকলেরই পারঙ্গমতার স্ফুরণ কি ওই দশটা বছরেরই সীমাবদ্ধ সময়ে? আর যদি এমন হয়, যিনি লিখছেন সেই ষাট বা সত্তর দশক থেকে, অন্বেষণ করে ফিরছেন তাঁর নিজস্ব মাতৃভাষাকে, আর তা তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন দু/তিন দশকের নিবিড় অনুশীলনে, তাঁর শ্রেষ্ঠ উচ্চারণটি ঘটল নব্বই দশকেরই সূচনায়, তাঁর অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের সুবিচারটা হবে কোন নিরিখে? 'দশক' শব্দটির প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে তখন থেকেই আমাদের মনে তৈরি হতে থাকে যাবতীয় সংশয় আর দ্বিধা, কুণ্ঠা আর সংকোচ। আমাদের এই ভাবনাচরিত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের চিন্তাসূত্রের কোনো সাযুজ্য আছে কি?– আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠি। আমাদের ঔৎসুক্যের এই দাবি যেন সম্পূর্ণতই মিটিয়ে দেন এই মুহূর্তের ওপার বাংলার অন্যতম কবি-ব্যাখ্যাতা-সমালোচক আবু হাসান শাহরিয়ার তাঁর একটি চিন্তাঋদ্ধ প্রবন্ধে :

'পঞ্চাশে আবির্ভূত কবিদের অনেকেরই উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ আমরা ষাট-সত্তর-আশিতে পেয়েছি। ষাটে আবির্ভূতদের অনেকেই আশি-নব্বইয়ে সে পাঠককে ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। সত্তর-আশিতে আবির্ভূতরা এখনও দিয়ে চলেছেন। নব্বইয়ে আবির্ভূতরাও দেবেন। যে-কোনও দশকেই, সেই দশকে আবির্ভূত কবিদের চেয়ে, পূর্বজদের দান বেশি। এবং যিনি প্রকৃত কবি, তিনি দশকে নন, এককে বাঁচেন। দশক গৌণ কবিদের আশ্রয়। কোনও কবি যখন আবহমান কবিতার বড় রাস্তায় হাঁটার যোগ্যতা হারান, তখনই তিনি দশকের কৌটারি সুযোগ নিয়ে টিকে থাকতে চান। দশ-বিশটি নবিশি কবিতা লিখে কে কোন্ দশকে নাম নিবন্ধন করালেন, তা একটি মামুলি বিষয়।'

[কবিতার বাঁক অথবা বাংলা কবিতার ৫০ বছর]

তিনটি খাঁটি কথা উঠে আসে আবু হাসান শাহরিয়ারের এই বিবৃতি থেকে। 'দশক' এই ভাবনার পেছনে একটা পরম্পরা আছে, ঐতিহ্য আছে, ধারাবাহিকতা আছে। অপ্রধান কবিদের অল্পায়ু আশ্রয় দশটা বছরের সীমিত হিসেবে, মুখ্য কবিদের অবস্থান দশক থেকে দশকান্তরে, বস্তুত দশকে নয়, এককে। আর স্বীকার্য এটাই যে যে-কোনো দশকেই পূর্বসূরীদের একটা উদাহরণীয় ভূমিকা থাকেই।

দশক এই ব্যাপারটা নিরালম্ব বায়বীয় কোনো ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র হিসেবের সুবিধের জন্য আলোচনায় এটি ব্যবহার্য। আসলে এটি হলো নিছক একটা গাণিতিক মাপ, ফিতে, একটা গজকাঠি, যা দিয়ে জরিপ করা হয় দশটা বছরকে। ওই দশটা বছরই যে একজন কবির স্ফূর্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশকাল বলে মেপে নেবো আমরা, তা তো নয়; বরং একটা পুরো দশকই তাঁর হাত পাকাবার কালখণ্ড, তালিম নিয়ে রেওয়াজ করার পর্ব, তারপর হয়তো তাঁর মঞ্চাবির্ভাবের লগ্ন। এই দশকের কথা বলতে বলতেই আমি তাকাই নব্বইয়ের কবিদের দিকে, কবিতাসম্ভারের দিকে। প্রায় অগন্দনীয় তাঁদের সংখ্যা, এবং ক্রমবর্ধমান। এত এত তরুণ কবিতার দিকে ঝুঁকছেন কেন? সে কি এইজন্য যে তাঁদের ভাবনায় কবিতামাধ্যমটা খুব সহজ অনায়াসসাধ্য ঠেকছে? অন্তত গদ্য লেখার থেকে কম অনুশীলনসাপেক্ষ? কবির তকমা অল্প পরিশ্রমে জুটে যাবে বলে? জীবন যত সংঘাতময়, বিশ্বাসবর্জিত, মূল্যবোধহীন হয়ে যাচ্ছে তাতে শেষ কথা বলে উঠবেন একজন কবিই– এই ধারণা থেকে? কিংবা কবিতারই নিজের আকর্ষণশক্তির দৌলতে? হয়ত এর সবকটিই প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠতে পারে আমাদের কাছে, আমাদের বিচারবোধের কাছে। যতই বলি মূল্যায়নের জন্য ন্যূনতম একটা সময়দূরত্ব বাঞ্ছনীয়, যতই বলি বড় বেশি সামনে থেকে দেখাটা একধরনের বিচ্যুতি যা একই সঙ্গে ভ্রমাত্মক, তবু আমাদের এ-খবরও তো রাখতে হয়, কাদের সূচনার মধ্যেই জেগে উঠছে সুপ্ত সম্ভাবনা, কারা তাঁদের সামর্থ্যের স্বাক্ষর রেখে নব্বইকে দিনে-দিনে পৌঁছে দেবেন পরবর্তী দশ বছরের কোঠায়, শূন্য দশকের দিকে। পৌলমী সেনগুপ্ত, প্রসূন ভৌমিক, বিভাস রায়চৌধুরী, শ্রীজাত, অংশুমান কর, রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রূপক চক্রবর্তী, রাণা রায়চৌধুরী, মন্দাক্রান্তা সেন, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, রোশনারা মিশ্র, সব্যসাচী ভৌমিক, সাম্যব্রত জোয়ারদার, সার্থক রায়চৌধুরী, সুমিতেশ সরকার, সেবন্তী ঘোষ, সৈকত চক্রবর্তী, শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়, কিংবা ওপার বাংলার টোকন ঠাকুর, শামীম রেজা, আলফ্রেড খোকন, কবির হুমায়ুন, মোস্তাক আহমাদ দীন, রহমান হেনরী, সরকার আমিন, শামী-মুল হক শামীম, কুমার চক্রবর্তী, মুজিব মেহদী, কাজল কানন, চঞ্চল আশরাফ, বায়তুল্লাহ্ কাদেরী– এই যে এত নামের অজস্রতা, এ-থেকে ছেঁকে নিয়ে তাঁদের সম্পন্নতার নিরিখে,

বিষয়নৈপুণ্যের বিচারে এবং আঙ্গিকপটুতার মানদণ্ডে আমি কি জানি না নব্বইয়ের সময়-পরিসরে কে কে আমাদের প্রত্যাশা করে তুলতে পারেন, কাদের নিয়ে আপাতত আমরা লালন করতে পেরেছি আমাদের স্বপ্ন, কাদের হাতে ছলকে উঠছে সত্যিকারের কবিতার স্মরণ; উঠছে কাদের প্রয়াসের সিংহভাগ, সমগ্রত গভীরতাছুট হয়ে যাচ্ছে কাদের গাম্ভীর্যহীন লঘু উচ্চারণ।

৩.

একটা দ্রুত পাঠ নেওয়া যাক এপার বাংলার নব্বইজাত কিছু উচ্চারণ-বিভঙ্গের। বলা বাহুল্য, কারুরই সম্পূর্ণ কবিতার উদ্ধার এখানে সম্ভব নয়, নির্বাচন করে নিচ্ছি কয়েকটি খণ্ডপঙ্ক্তি–

১. কোনো জাহাজই ডোবে না, আত্মহত্যা করে — *আবীর সিংহ*

২. বৈষ্ণব কবিরা কিন্তু যাই বলুন, রাধা
গড়িয়াহাটে আপনাদের সৌন্দর্য আলাদা — *শিবাসিস মুখোপাধ্যায়*

৩. দু'দিকেই হাত ছুঁড়ে দিয়ে
ভিখিরি গলায় তোলে গান
চোর, তুমি চুরি করে যাও
গৃহস্থরা থেকো সাবধান — *বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়*

৪. বন্ধুদের বিয়ের নেমন্তন্ন পেলে মনে হয়
আমি তোমার ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথামৃত পড়ছি
বন্ধুদের বিয়ের নেমন্তন্ন পেলে মনে হয়
আমি অভিমান শিখছি ঝাঝিমাল্লার কাছে
বন্ধুদের বিয়ের নেমন্তন্ন পেলে মনে হয়
দমকল আসছে নৌকো নেভাতে
আর আমি দুলে দুলে পার হচ্ছি তোমার শৃঙ্খল — *রানা রায়চৌধুরী*

৫. শহরের কুম্ভস্নানে অটোরাই নাগা সন্ন্যাসী — *পৌলমী সেনগুপ্ত*

৬. সত্যি কথা বলতে কী দস্যু থেকে কবি হয়েছি অনেকবার,
কবি থেকে দস্যু হতে পারিনি একবারও
সত্যি কথা বলতে কী চোখের জলের থেকে ঘাম আমার বেশী প্রিয়,
তবু শ্রেষ্ঠ কান্নাগুলো রেখে গেলাম
সত্যি কথা বলতে কী আত্মহত্যার কোনও পরিকল্পনাই আমার ছিল না,
আমি শুধু একটু ঝলসে যেতে চেয়েছিলাম
আমি শুধু... — *বিভাস রায়চৌধুরী*

৭. তোমার জন্য পার্থ-দীপেশ, তোমার জন্য জোড়া গির্জের চূড়োয়
বাবুই পাখির তুচ্ছ বাসা... গেরিলাদের সাংকেতিক চিঠি:

পাঠোদ্ধার হয়নি আজও– তুলকালাম গোয়েন্দা দফতরে...
এ-ঘর থেকে ও-ঘর ছুটছে রংবেরং পদস্থ কর্তারা! — *অর্ণব সাহা*

৮. দিন অসম্পূর্ণতার কিনারে এসে হাই তুলছে,
এরপর সন্ধ্যা নামবে
কী হল আর কী হল না–

এসব নিয়ে হইহুল্লোড় বরং থাক; তার চেয়ে চলো
তরুণ কবির মুখোমুখি আমরা জেনে নিই
জীবন সম্পর্কে, ঠিক এই মুহূর্তে
তিনি কী ভাবছেন... *সুমিতেশ সরকার*

৯. স্টোনচিপ না খুদে উল্কা? চোরকাঁটা না তারার কুচি?
কারা আমার পথ আটকাচ্ছে? বলছে আর না যাওয়াই উচিত? *শ্রীজাত*

১০. খিদের যন্ত্রণায় কেঁদে উঠছে শিশুরা
শত্রু খুঁজে পাচ্ছে না শত্রুকে, সূর্যকে বিশ্বাস করছে না রোদ্দুর
কথা বলে পরক্ষণেই কথার দিকে সন্দেহের তির ঘোরাচ্ছে মানুষ,
সমুদ্র তড়িঘড়ি উঠে পড়তে চাইছে এক ভাগ মাটির ওপর,– আর
–'আমি তো বলিনি,–বিশ্বাস করো আমাকে'–বলে
চিৎকার করে উঠছে পৃথিবী *সার্থক রায়চৌধুরী*

১১. গাছের বাকলে লেখা
ছুরি দিয়ে এসব কবিতা
যদি কোনোদিন এক
অবাক রাখাল পড়ে দ্যাখে
মেঘ চড়ানোর ফাঁকে
আনমনে, হয়ে দলছুট

এসব কবিতা হোক
তার চুলে পাতার মুকুট *শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়*

১২. জিন্‌স পরা ছেড়ে দিতে পারি
তুমি যদি বলো; অন্য নারী
হয়ে যাব অতি অনায়াসে।
যে মেয়ে তোমাকে ভালোবাসে
তার ছোট চুল, বিনা তেলে
(তুমি যেন কাকে বলেছিলে)
... সে কখনো হতেই পারে না *মন্দাক্রান্তা সেন*

'কোনো জাহাজই ডোবে না, আত্মহত্যা করে' এই অনন্যস্বাদ পঙ্‌ক্তি যিনি লিখতে পারেন, তিনি ক্রমশই হারিয়ে যেতে থাকেন কেন আমাদের নিয়মিত পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে? অন্য আরেকজনের প্রাক্-আত্মহত্যা বিষয়ক পরিকল্পনার বদলে শুধুই ঝলসে যাওয়ার আর্তি। কেউ গাছের বাকলে উৎকীর্ণ করেন কবিতা, যা তাঁর প্রত্যাশা এক রাখাল বালক ঘোষ চড়ানোর ফাঁকে পড়ে নেবে একদিন হঠাৎ, আবার তরুণ কবির কাছে কেউ রাখেন জীবনদর্শন সংক্রান্ত কিছু গভীর অতলান্ত প্রশ্ন; কেউ দেখছেন রোদ্দুরের কাছে সূর্যই প্রতারক, অবিশ্বাসী, আবার কারুর ভাবনাপটে বৈষ্ণব কবিতার অনুষঙ্গের বিপ্রতীপে উঁকি দিয়ে যায় কলকাতার এক ঝাঁ-চকচকে এলাকা। অন্যের বিবাহবার্তায় কারুর মনে হয় মাঝিমাল্লাদের কাছ থেকে অভিমানের পাঠ নেওয়া শ্রেয়তর, আবার প্রেমিকের কথায় হাল আমলের জিন্‌স ছেড়ে তার বদলে সাবেক এক নারীতে রূপান্তরিত হতে চায়

অন্য আরেকজন।

কারুর হাতে স্ববশ গদ্যের প্রবহমানতা, আবার বিষয়ের শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কেউ বেছে নেন ছন্দের নিখুঁত চাল। একটা ব্যাপারকে মান্যতা দিতেই হবে যে, সকলেই নয়, কিন্তু নব্বইয়ের যাঁরা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন আমাদের সমীক্ষায়, তাঁরা তাঁদের নিহিত কবিতাবোধের সঙ্গে বাঞ্ছিত দক্ষতায় আঙ্গিকসচেতন হয়েও উঠছেন গোড়া থেকেই। ছন্দকে, সেই সঙ্গে অভিনব মিলকে নতুন করে ফিরিয়ে আনছেন তাঁরা উচ্চারণের পরতে পরতে। কখনো-কখনো হয়তো মাত্রাতিরিক্ত প্রকরণমনস্কতা ও তির্যক মিল প্রয়োগের ঝোঁক একধরনের অনভিপ্রেত মুদ্রাদোষে আক্রান্ত করছে এতেদর কয়েকজনকে, চটুল চটকদারিত্বে অগভীর হয়ে যাচ্ছে তাঁদের বিষয় উত্থাপন। ভাবনা অনুযায়ী ছন্দায়নের উল্টো পথে গিয়ে এদের কেউ কেউ যে পূর্বপরিকল্পিত ছন্দ নির্ধারণ করে অগ্রসর হতে চাইছেন ভাবনার দিকে, সেটা উত্তীর্ণ কবিতার বিচারে কতখানি গ্রহণযোগ্য শর্ত হতে পারে তা বোধ হয় সংশয়ের বিষয়। বক্র প্রান্তিক মিল নিয়ে এদের নিরীক্ষা অবশ্যই সাহসী এক পদক্ষেপ, কিন্তু তা যদি নির্বিচারে প্রযুক্ত হতে থাকে, চর্চিত হয় নিরন্তর কবিতার শরীরে, পাঠকের পক্ষে সেটা শুধু ক্লান্তিকরই হয়ে ওঠে না, কৃত্রিম এক গিমিক এবং অস্বাস্থ্যকর অভ্যেসেও পর্যবসিত হয়। আর চিত্রকল্পের দিক দিয়েও, মানতে হবে, নব্বইয়ের কবিরা অনেক টাটকা, আনকোরা, সময়সম্মত। অটোরা যে 'নাগা সন্ন্যাসী'– এই বাক-উপমা চমকে দেয় আমাদের, আমরা বুঝে নিই প্রাত্যহিক পারিপার্শ্বিকতা থেকে তুলে আনা এই যে স্বতন্ত্র ঘরানার ছবি, তা এক লহমায় ভিন্নমাত্রিক করে তুলতে পারে একজন কবির উপস্থাপনা; কিংবা পরিবেশনভঙ্গি কত কালোচিত হতে পারে, কতখানি ছুঁয়ে থাকতে পারে ঠিক এই মুহূর্তের কোনো বিষয়, আমরা তা বাজিয়ে নিতে পারি মাত্র দুটি পঙ্ক্তির সঙ্গ-সৌজন্যে : 'বনেদি বুনোট থেকে ইতিহাস খুলে ফেলছে ইট/প্রোমোটার মেপে নিচ্ছে রায়বাড়ি কত বর্গফিট' (সৈকত চক্রবর্তী)। সময়াতীত উচ্চারণের জন্ম দেওয়ার পাশাপাশি সময়মুখী হওয়াটাও এইভাবে জরুরি হয়ে ওঠে একজন কবির পক্ষে, চিরন্তন উপলব্ধির হাত ধরেই কখনো-কখনো উঁকি দিয়ে যায় একান্ত তাৎক্ষণিকতা, আমরা স্বস্তি পাই দেখে যে একজন কবি ঠিক এই সময়টার মাটিতে পা রেখেই নিঃশ্বাস নিচ্ছেন নিজের মত করে, কুড়িয়ে নিচ্ছেন সময়ের তাপ, তার উদ্বেগ-আবেগ, সাফল্য-ব্যর্থতা, বিয়োগান্তক ভাবনা, সদর্থক উপকরণ। 'চোর, তুমি চুরি করে যাও/গৃহস্থরা থেকো সাবধান,'– এ-শুধু বিচ্ছিন্ন লঘু দুট পঙ্ক্তির চটকদারী বিন্যাস নয়, এর সঙ্গে প্রচ্ছন্নতায় সম্পৃক্ত হয়ে থাকে অনিবার্য এক সময়-প্রাসঙ্গিকতা, অবধারিত কালছাপ। পারিপার্শ্বিককে চিনে নিতে নিতে এভাবেই গড়ে ওঠে নব্বইয়ের ভাষা, তার চিত্রকল্পিত রূপ, নিজস্ব বাক্প্যাটার্ন, তার প্রতীক-অনুষঙ্গ-ট্রেডমার্ক। আর সঙ্গে আছে অবশ্যই এক দুর্বার আত্মপ্রত্যয়, যা থেকে এই দশকের অবস্থানে দাঁড়িয়ে বিভাস রায়চৌধুরী নির্দ্বিধ ঘোষণা রাখতে পারেন এইভাবে : 'বাহান্ন বা একাত্তর, আমাদের নব্বইয়ের ভাষা।'

৪.

একটু অনুপুঙ্খ বিশ্লেষে ধরা পড়ে, এখানকার নব্বইয়ের অন্তর্ভুক্ত কবিদের শাহরিক সচেতনতা ক্রমশই সপ্রতিভতর হয়ে উঠছে স্বকীয় স্টাইলে। সেভাবেই সম্ভাব্য হয়ে উঠছে তাঁদের ডিকশন, পটিয়সী লেখনীর কর্তৃত্ব, তাঁদের ক্যানভাস, এমন কি ব্যক্তিগত আঙ্গিক। আর ওপার বাংলার এই দশকের কবিদের পরিবেশনে যেন ততটা শহর নয়, প্রকৃতি, পল্লী, মাটি– এদের ঘ্রাণটাই বেশি করে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে, সবুজ পৃথিবী জড়িয়ে যায় তাঁদের উচ্চারণের পর্বে-পর্বান্তরে : 'একটি চুম্বন ল্যান্ডস্কেপের টানে মিশে যায় চিত্রার জলে।' ভুললে চলবে না, এই ঘরানারই আদি কবিপুরুষ

জীবনানন্দ। আসলে বাংলাদেশে জীবনস্রোতের দুটি দিক, তার মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে গ্রাম ও শহরের গল্প : একদিকে অনাবিল শান্ত সারল্যে লগ্ন হয়ে থাকার ছবি, অন্যদিকে নাগরিক কুলিশ-কুটিল যান্ত্রিক জীবনধারা। কথাটা মিথ্যে নয়, আমাদের থেকে বাংলাদেশ তার নিঃশ্বাসে প্রকৃতিকে গ্রহণ করতে পেরেছে অনেক, অনেক বেশি :

১. তীব্র ক্ষুধার তোড়ে ঢুলু ঢুলু চোখ...
শিশিরের মদ্যপান শেষে
দুধের শিশুর মতো পরিতৃপ্ত শুয়ে আছে ফসলের মাঠ। *রহমান হেনরি*

২. গ্রামে গিয়ে দেখি– পাখিগুলো পাতা হয়ে গেছে
পাতাগুলো পাখি,
এইভাবে ভাবি , জীবনের শিকড় আহা
এইসব আইসবার্গ এইসব ব্লিজার্ডের মাঝে,
আমরা তো এসে যাই অন্ধকারে–
অন্ধকারে অন্ধকারে, একা একা আজ রাতে *কুমার চক্রবর্তী*

৩. ... তুমি প্রত্নমেয়ে হয়া পইড়া আছো কোন এক
রাজবংশীর খড়ের ডেরায়। বীজের অঙ্কুর বনসাই হয়া
আছে, তারপরও কোন এক শিল্পী দুরন্ত তুলিতে প্রতিদিন
আঁইকা যায় সবুজ বীজ নয়া অজন্তায়। *শামীম রেজা*

৪. তোমার বাড়ির প্রিয়পথ দিয়ে আঙিনা অবধি
অন্ধকার ছুঁয়ে গেছে আমার পায়ের রেখা, অনন্ত রোদ্দুরে
বনের গভীর প্রেম কে বলে মুদ্রণযোগ্য নয়! *আলফ্রেড খোকন*

৫. তখনো পৃথিবীতে আলো এসে পৌছয়নি
নিকষ অন্ধকারে গজিয়ে ওঠেনি রুদ্র-রোষাণল, হিংস্রতা
নিষ্কলুষ ভালোবাসায় লাগেনি কলঙ্কের দাগ
সঙ্গম-উৎসবে মাতোয়ারা গ্রহ-নক্ষত্র
তখন পৃথিবীতে ছিলো না প্রাণের অস্তিত্ব *শামীমুল হক শামীম*

৬. মাটিরও শেষন্তর থাকে। আজলা আজলায়
ভালোবাসি ভালোবাসি চিৎকারে জ্যোৎস্নারা ম্লান হয়ে গেলে,
তুমুলটানে ছুটে আসে মহামারি জলের স্রোত। *কবির হুমায়ূন*

৭. অর্বাচিনের তৃষ্ণার আস্তো নদী হয়তো ছুড়ে দিলো কেউ
ওটা নদী নয়, হতেও পারে নদীর সংশয় *কাজল কানন*

এইসব উচ্চারণে ইট-সুরকি-সিমেন্টের জটিল যান্ত্রিক শহর নেই, নেই বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা, বরং যা আছে তা হলো ভিজে মাটির গন্ধ, সবুজ বীজের স্বপ্নময়তা, ভরপুর ফসলমাঠ, রোদ্দুর-জ্যোৎস্না-শিশিরের নিবিড় নিটোল আবেদন আর বহতা নদীর আর্দ্র অনুষঙ্গ। কবিতার মেজাজ নির্ণয়ে এদের ভূমিকা সন্দেহাতীত। কিন্তু একই সঙ্গে বোধ হয় এটাও মানতে হবে যে এইসব দৃষ্টান্তের সূত্র যে ভাষাচরিত্রের প্রয়োগ, তা যেন ততখানি ধারালো কিংবা সপ্রতিভ নয়, পাঠকের তরফে যা সঙ্গতভাবেই প্রত্যাশিত। ছন্দের একটা নিহিত জোরের জায়গা আছে,

অপ্রতিরোধ্য স্পন্দন আছে, যা কবিকে বাধ্যতায় সম্ভবত আঁটসাট হতে শেখায়, ঘনবদ্ধ করে তোলে তাঁর সামগ্রিক পরিবেশনা, ছেঁটে ফেলতে পারে অকারণ শব্দের ভার। কথার মধ্যে তীব্রতার সঞ্চার ঘটতে পারে এভাবেও। শহরজীবনও তাঁর একটা বাঞ্ছিত উপকরণ– নাগরিক দুর্গতি, সংকট, জটিলতা, বিভ্রান্তি, উদ্বেগ, অস্বাচ্ছন্দ্য, সম্পর্কহীনতা, অনিশ্চয় গোলকধাঁধা– এসব নিয়েও। আর এই বাতাবরণে ওঠা-বসা-চলা-ফেরা করতে করতেও এই মুহূর্তের একজন কবির ভাষার ছাঁদ তৈরি হতে থাকে, যুগপৎ চরিত্র অর্জন করে নিতে থাকে তাঁর আঙ্গিক, তাঁর প্রাকরণিক কৃৎকৌশল, বলবার কথাটা বলবার মতো করে লেখবার ভঙ্গি।

তেমন তীব্র তীক্ষ্ণ গদ্যেরও আছে একটা কাঙ্ক্ষিত 'কামড়' কিংবা সঠিক পর্দায়। প্রকৃতির পটপ্রেক্ষায় উপস্থাপিত ওপরের যে দৃষ্টান্তগুচ্ছ, তার ভাষা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্রবান, কতটা টানটান তার অভিঘাত, সংবেদন রচনায় কতটা সফল, এবং নব্বই দশকে নিঃশ্বাস নেয়া একজন কবির কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশাপূরণ কতখানি ঘটতে পারে ইত্যাকার উদাহরণের সৌজন্যে– এসব প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর জমা থাক পাঠকের কাছেই। আর ওই যে বললাম শহর আর প্রকৃতির ভাগাভাগি অবস্থান, তার একটা মীমাংসিত সত্য প্রাপ্তব্য হোক রুদ্র আরিফ-এর কথায় : 'শহরে শহরে নাগরিক প্রান্তরে/গাঁথা হোক সবুজ দেয়াল...।' কখনো শহরের কবিতায় গ্রাম, গ্রামীণ অনুষঙ্গ, লোকভাষা, কখনো মেঠো বাতাবরণে এক টুকরো শহরের ইতিকথা– এমন ইঙ্গিত মেলবন্ধন, মন্দ কী! নব্বইয়ের কবি শুধু গ্রাম নিয়ে কবিতা লিখে কুমুদরঞ্জন মল্লিক হতে চান না; আবার শুধু শহরে আটকে গিয়ে হতে চান না বিশুদ্ধ নাগরিক কবি সমর সেন। বরং তাঁর কাছে আজো অন্বিষ্ট জীবনানন্দ হয়ে ওঠা, তাঁর শহর-গ্রামের সমীকরণের কাছে চূড়ান্ত প্রবণতার সুবাদে নতজানু হওয়া– যাঁর চোখে নদী ছিল ট্রামের লাইনের মতো, কিংবা ট্রাম-বাস নিঃশব্দ নদীর জলে হাঁসের মতন; বালিগঞ্জের একটা বাড়ির ডাইনিং রুম, সেকি শুধু বালিগঞ্জ? নাকি বাংলার আকাশের নিচে, বাঙালির রাস্তাঘাট নক্ষত্র নিঃশ্বাসের মধ্যে অনির্বচনীয় তার বিস্তার!